দৈনিক বাংলা 011

তারিখ ... 11.3.85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 2 ...

পাঠ্যবই : প্রতি বছরের যন্ত্রণা

হোসনে আরা শাহেদ

পাঠ্যবই স্কুল অঙ্গনের ব্যাপার। কিন্তু আজকাল মনে হয় জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন সংবাদ। নিত্য প্রায় সংবাদপত্রের শিরোনামে শোভা পাচ্ছে। এই গুরুত্ব শিক্ষার প্রাধান্য বৃদ্ধির কল্যাণে নয়, বরং উল্টো। কিছু কারণে।

এখন মার্চ মাস। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি। এখনও স্কুলের সব কটি পাঠ্যবই মেলেনি। নবম শ্রেণীর পৌরনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্যিক গণিত, ইতিহাস, উচ্চতর বাংলা, সঙ্গীত, অষ্টম, পঞ্চম ও চতুর্থ শ্রেণীর অংক, তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা, সমাজ পাঠ, বিজ্ঞান—আজও বের হয়নি। নবম শ্রেণীর যেসব বই পাওয়া গেছে, তাও ফেব্রুয়ারী অবধি মেলেনি। মার্চ-এর শুরু থেকে আজ ইংরেজী, কাল বিজ্ঞান ১ম খন্ড, পরশু বিজ্ঞান ২য় খন্ড, তরশু ভূগোল—এমনিভাবে এক এক করে বইগুলো আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। কেবল নবম শ্রেণী কেন, অন্যান্য শ্রেণীর বেলাও তাই। জানুয়ারীর মধ্যে বই কেনা ছিল ছাত্রছাত্রীর জন্য স্বপ্নই।

প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত বই সরকার থেকে মুফতে দেয়া হয়। ১৯৮৩ সাল থেকে এই ব্যবস্থার সূত্রপাত। প্রথম বছর কেবল প্রাইমারী স্কুলগুলোতেই এই ফ্রি বই দেয়া হয়েছিল, ১৯৮৪ সাল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের সঙ্গে যুক্ত সকল প্রাইমারী ক্লাসের জন্যই দেয়ার নিয়ম চালু হলো। কিন্তু প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর সব বই এখনও মেলেনি। এখানে অসুবিধা, যেহেতু স্কুলের মাধ্যমে এই বই বন্টন হয়, যেহেতু অভিভাবক স্কুলে খোঁজ করে হয়রান হন আর স্কুলগুলো শিক্ষা অফিসে লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে পেরেশান, তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে উৎকণ্ঠা। এই উৎকণ্ঠা ছাত্রের, এই উৎকণ্ঠা অভিভাবকের। উৎকণ্ঠা স্কুলেরও। নতুন বছরের স্কুল খোলার সঙ্গে নতুন ক্লাসের নতুন বই পাওয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। স্কুল খুলে তাঁরা কী করবেন, রুটিন করে ক্লাস বসিয়ে কী পাঠ তাঁরা দেবেন?

অথচ জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত সময় পড়াশোনার জন্য সুসময়। গরমের অস্থিরতা, বৃষ্টির অসুবিধা, ঋতু বদলের বিড়ম্বনা—মোটামুটিভাবে এ সময় থাকে না বলে চলাফেরা, কাজেকর্মে যেমন স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তি থাকে, তেমনি মনেও প্রচুর উদ্দীপনা। সব মিলিয়ে এ সময়টায় পাঠ প্রদান ও পাঠ গ্রহণে যেমন দ্রুত এগুনো সম্ভব, তেমন বছরের আর কখনও না।

দুঃখের ব্যাপার, টেক্সট বুক বোর্ডের অবদানে বছর শুরুর প্রারম্ভিক তিন তিনটি সুবর্ণ মাসও বিফলে যাচ্ছে। বইয়ের জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক তীর্থের কাকের মত বসে থাকে। কচি-কোমল শিক্ষার্থীরা ক্লাস রুমে হল্লা করে গোল্লাছুট খেলে। শিক্ষকবৃন্দের অবশ্য সে সুযোগ নেই কিন্তু বইয়ের জন্যে দৌড়াদৌড়ি তাদের করতে হয়। বাবা-মা থাকেন বইয়ের আশায় আর প্রাপ্তি সংবাদের পর মাতেন দারুণ প্রতিযোগিতায়। প্রতিযোগিতার কারণ বই একসাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সরবরাহ করাও হয় না। ফলে না, এসব কিছুই হয় না। ক্যালেন্ডারের পাতা হিসেব মতোয় উল্টায়। দিন-রাত্রি যথা নিয়মেই আবর্তিত হয়। তাহলে উপায়? উপায় হয়েই যায়। বেচারা অভিভাবককেই তার মাশুল দিতে হয়। একজনের জায়গায় পাঁচজন শিক্ষক রেখে এই ক্ষতিপূরণের প্রয়াস চলে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই সব ধন্বন্তরী শিক্ষকের সন্ধান চালাতে হয় যাঁরা অলৌকিক ক্ষমতা রাখেন অব্যর্থ সাজেশন প্রদানের। এমনটিই চলছে।

এক বছর নয়। ফি বছর। প্রতি বছর সীজনমাফিক একই সমস্যা, একই সংকট, একই চীৎকার, একই শিরঃপীড়া, একই লড়াই, একই পাল্লা দেয়ার পালা।

শিক্ষা জীবনের এই ছবি প্রতিফলিত হয় পত্রিকার পৃষ্ঠায়। বই যখন মেলে না, তখন যেমন সংবাদ হয়, বই যখন পাওয়া যায় বা যেতে শুরু করে, তখন তাও খবর হয়ে দাঁড়ায়। বইয়ের জন্য যে লাইন, বইয়ের জন্য যে বিবস্ত্রকর কাড়াকাড়ি, তাও ধরা পড়ে সংবাদপত্রের ক্যামেরায়।

আগে গেলে আগে পাওয়ার নীতি ছাড়াও আছে চিরন্তন কৌশল ও প্রভাব প্রতিপত্তি। নির্ভুল হিসেবের মতো এরপর শুরু হয় ব্ল্যাকে বই কেনার পদ্ধতি। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত না হয় কম পড়িয়ে অথবা ক্লাসে না পড়িয়ে বাড়িতে পড়ার নির্দেশ দিয়ে দায় সারানো যাবে, কিন্তু উপায় কি নবম শ্রেণীর? তাদের তো সিলেবাস মোটে দু বছরের। তিন শ পঁয়ষট্টি দিনের বছরের বায়ান্নটি সাপ্তাহিক ছুটি ও পঁচাশি দিন অনুমোদিত ছুটির পরেও খরা, বৃষ্টি, প্লাবন প্লাবনের মত আকস্মিক ছেদের মধ্যে বছরের এক চতুর্থাংশ সময় বই হাতে না পাওয়ার ঘাটতি পূরণের কী পথ?

বই প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে বলে কি সিলেবাস সংকুচিত হয়? অথবা প্রশ্নপত্র সহজতর হয়? নাকি সময়ের মাপ করে পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়?

কিন্তু কতো আর সহ্য করা যায়। কেন এমন হয়। কী এমন বাধা যে সময়ের বই সময়ে পাওয়া এতেই দায়। কী সে দুর্লংঘ্য প্রাচীর, যা ভাঙতে সংশ্লিষ্টদের ক্লেশ হয়? দেশটি গরীব। জনসংখ্যা বুঝি দশ কোটি। এই দশ কোটির কয় পার্সেন্ট শিক্ষা লাভের বয়সী, কয় পার্সেন্ট শিক্ষা লাভে ব্রতী, কয় পার্সেন্ট স্কুলগামী, কয় পার্সেন্ট কত দিন স্কুলে যাওয়ার সাধ্য রাখে, কয় পার্সেন্ট মাঝপথে কেটে পড়ে—এসব তথ্য বই সংশ্লিষ্টদের নখদর্পণে না থাক, ফাইলে তো থাকার কথা অবশ্যই। কাজেই কোন বই কতোটা দরকার—তার ব্যবস্থা এক বারে এবং সময় থাকতে করা কি আসলেই কঠিন ব্যাপার? পরিকল্পনা করেই তো কাজে হাত দিতে হয়—তাহলে জানুয়ারীর বই কোন ভরসায় জানুয়ারীর মাত্র অল্প কিছুদিন আগে প্রিন্ট অর্ডার পায়? জানুয়ারীর জন্য যে বই, তার তো আগের বছরের ডিসেম্বরেই বাঁধাই হয়ে দোকানে দোকানে পৌঁছানোর কথা। কেন, তা হয় না? এতো গুলো বছরের মধ্যে কেন তা একবারও হলো না?

হয় তো কারণ কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে, কৈফিয়তও হয়তো বিস্তর মিলবে, কিন্তু তার সবটাই হবে আত্মসমর্থন, আত্মবিশ্লেষণ নয়। কেন শিক্ষার জন্যে এই ভোগান্তি? ত্রুটি কি কেবল ব্যবস্থাপনায়? বিচ্যুতি কি কেবল প্রকাশনার শ্লথ পদ্ধতিতে?

বোর্ডের বইয়ের মান নিয়েও বহু অভিযোগ। নীচু মানের এসব প্রকাশনা কতোটা আকর্ষণ করে মন? নিউজপ্রিন্টে ঝাপসা ছাপা, শিথিল বাঁধাই, লেপটানো চিত্রায়ণ, ভুল বানান, সব মিলে বুঝতে কষ্ট হওয়ার নয়, এসব বই প্রকাশে সমষ্টিগত সহযোগিতা ও ঐক্যবদ্ধ ভাবনা বলতে যা বোঝায়, তা একটুও নেই। এ কারণেই আজকের দুষ্প্রাপ্য পাঠ্যবই শিক্ষার্থীর মন ভরায় না—ভারাক্রান্ত করে। বইয়ের একেক অধ্যায়ে একেক ধরনের বানান, অংকে ভুল ফিগার, ভুল ফলাফল বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন অনুশীলনী—বই রচনা থেকে আরম্ভ করে প্রকাশনার প্রতিটি স্তরে নির্মম উদাসীনতা, অসহযোগিতা ও হুড়োতাড়ার প্রমাণ। জীবনের চাহিদা পূরণ দূরে থাক, পাঠ্য বই আসলেই পাঠ্য কি না সে প্রশ্ন আছে সবার মনে। যুগোপযোগী প্রয়োজনানুগ যে পাঠ্যসূচী তার সফল বাস্তবায়নের বাহন একমাত্র পাঠ্য বই। সেই পাঠ্য বইয়ের আজ এ কি দশা?

এমন নয় যে পাঠ্য বইয়ের বিশৃংখল অবস্থা ও দীন দশা নিয়ে কথা হচ্ছে না কিংবা তা বোর্ড কর্তৃপক্ষের জানা নেই, তাহলে?

জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের দেখি মীমাংসা হয়ে যায়, আর আমাদের পাঠ্য বই সংকটের একটা সুরাহা হয় না?